তারিখ 12 JAN 2016

বছরের অর্জন

ফিচার

মাটির স্কুল ভবনটি এখন জাতীয় ঐতিহ্যের তালিকায়

নজরুল ইসলাম
বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

শতবর্ষী মাটির স্কুল ভবনের খোঁজে

ফিচারটি ছাপা হয়
৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

গত ১ আগস্ট প্রধান শিক্ষকের হাতে বিদ্যালয়ের 'মৃৎভবন' প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের তালিকায় নেওয়ার সনদ তুলে দেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলতাফ হোসেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর তাদের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাকির হোসেনকে কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের মৃৎভবন রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে

পাহাড়-সমুদ্রবেষ্টিত চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পারে বোয়ালখালী। উপজেলাটির অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালে। বিদ্যাপীঠটির সাফল্যের পালকে রয়েছে অনেক অর্জন। আর এ কারণেই এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্য অনেকের মতো আমারও দুর্বলতা।

কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম আকর্ষণ এর নির্মাণশৈলী। ৯৮ বছরের পুরনো মাটির তৈরি বিশাল বিশাল শ্রেণিকক্ষ। ২০৩ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৪৫ ফুট প্রস্থের এ ভবন নির্মাণে মাটি ছাড়া ব্যবহার করা হয়েছে টিন, গাছ, বাঁশ ইত্যাদি। মিয়ানমারের (তৎকালীন বার্মা) রাজধানী ইয়াংগুন (রেঙ্গুন) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বাঁশ ও গাছ। দীর্ঘ সময় নিয়ে ভবনটি নির্মাণ করা হয় ব্রিটিশ স্থাপত্যশৈলীতে। কালের বিবর্তনে এতে যুক্ত হয়েছে পাকা-আধাপাকা আরো কয়েকটি ভবন। তবে মূল ফটক পেরিয়ে বিদ্যালয় আঙিনায় প্রবেশ করলে মাটির তৈরি আকর্ষণীয় ভবনটি দেখে যে কেউ একবারের জন্য হলেও থমকে যেতে বাধ্য।

গৌরবের আরো একটি বড় বিষয় রয়েছে। ১৯৬২ সালে এখানকার শিক্ষার্থীরা নির্মাণ করে দেশের স্কুলপর্যায়ে প্রথম শহীদ মিনার। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে দুই একর জায়গাজুড়ে বিশাল দিঘি। এর চারপাশে সারি সারি বৃক্ষরাজি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লাগানো এ বৃক্ষরাজি বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে অন্যরকমভাবে সাজিয়েছে। ফলে এর কৃতিত্বস্বরূপ ২০০৯ সালে স্কুলপর্যায়ে বৃক্ষরোপণে প্রথম স্থান অধিকার করে, অর্জন করে জাতীয় পুরস্কার। প্রতিদিন বিকেলে শান বাঁধানো ঘাটে দিঘির স্বচ্ছ পানিতে মাছের খেলা দেখতে এলাকাবাসী ছাড়া ছুটে আসে বাইরের অনেকে। প্রতিবছর শীতে অতিথি পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয় বিদ্যালয় অঙ্গন ও সংলগ্ন দিঘি।

অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন রচনার। নিশ্চিত ছিলাম না, তবে অনুমান ছিল, এ রকম মাটির স্কুল বোধ করি এ দেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। সুতরাং একে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবেও সংরক্ষণ করা উচিত।

২০১০ সালের ১২ আগস্ট 'সবুজ ছায়াঘেরা এক বিদ্যাপীঠ' শিরোনামে একটি ফিচার লিখলাম 'সিলেবাসে নেই' পাতায়। ছাপা হলো। ছাপা হলেই তো আর সব প্রতিবেদন সাড়া তোলে না। আমি নিজেও দুই দিন পর অন্য কাজের ভিড়ে হারিয়ে গেলাম।

২০১৩ সালের ২০ আগস্ট সকালে প্রতিদিনের মতো বোয়ালখালী উপজেলা সদরের উদ্দেশে বাড়ি থেকে রওনা হই। প্রেসক্লাবে পৌঁছার পর খবর পেলাম, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মঈন উদ্দীন খান বাদলের উদ্যোগে বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ ড. মোবাশ্বের আলীর নেতৃত্বে একটি টিম ২২ আগস্ট কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাটির ভবন পরিদর্শনে আসছে। শুনে তো আমার রক্তে নাচন শুরু হলো। যথাসময়ে আমিও হাজির। ওই দিন ড. মোবাশ্বের আলীসহ তাঁর সঙ্গে আসা স্থপতিরা বিদ্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জানান, মাটির তৈরি স্থাপত্যকলায় ভরপুর এত বড় ভবন দেশের আর কোথাও নেই। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হলে এটি জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেবে। এ ছাড়া স্থাপত্যকলার শিক্ষার্থীদেরও গবেষণায় কাজে দেবে শতবর্ষী মাটির তৈরি ভবনটি।

বিদ্যালয়ের মৃৎভবনের সম্মুখভাগ। ছবি : কালের কণ্ঠ

অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের বিশ্রামকক্ষে অতিথিদের আপ্যায়নের সময় ড. মোবাশ্বের আলীসহ অন্যান্য স্থপতি ও মঈন উদ্দীন খান বাদলের সঙ্গে বিদ্যালয়টির শতবর্ষী মাটির ভবন সংরক্ষণের বিষয়ে আলাপ করি। পরে কালের কণ্ঠ'র ফিচার পাতা 'সিলেবাসে নেই' বরাবর আরেকটি প্রতিবেদন পাঠাই। ২০১৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় 'শতবর্ষী মাটির স্কুল ভবনের খোঁজে' শিরোনামের সচিত্র প্রতিবেদন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ বড়ুয়া জানিয়েছিলেন, কালের কণ্ঠ'র 'সিলেবাসে নেই' পাতায় প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর মঈন উদ্দীন খান বাদল ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেন। ২০১৩ সালের ১৭ নভেম্বর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যালয়ের হয়ে যোগাযোগ শুরু করেন এমপি মহোদয়। ওই বছরের ডিসেম্বরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে একটি নিরীক্ষা দল আসে। ফিরে গিয়ে তারা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে ইতিবাচক প্রতিবেদন দেন। পরবর্তী সময়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সহকারী পরিচালকসহ কয়েকজন কর্মকর্তা বেশ কয়েকবার এ ভবনের কার্যক্রম ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রতিবেদন দেন। এসব প্রতিবেদন ইতিবাচক হওয়ায় ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট বিদ্যালয়ের ভবন তিনি নিজেও সরেজমিন পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়ের নির্মাণশৈলী, স্থাপত্যকৌশল, স্থানীয় লোকজ শিল্পমান রক্ষার বর্ণনাসহ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠান প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক শিরিন আকতার। কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাটির ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার, উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। পরে এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয় মন্ত্রণালয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১ আগস্ট প্রধান শিক্ষকের হাতে বিদ্যালয়ের 'মৃৎভবন' প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের তালিকায় নেওয়ার সনদ তুলে দেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলতাফ হোসেন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর তাদের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাকির হোসেনকে কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের মৃৎভবন রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। এরই মধ্যে এ ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন বলে নিশ্চিত করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ বড়ুয়া।